International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 673-678
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i4.093

বিমল করের জাদুকর গোয়েন্দা কিকিরার চরিত্র চিত্রণ: একটি বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত

Received: 03.07.2025; Accepted: 09.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The vast expanse of Bengali literature is full of multifaceted detective characters. Although the seeds of detective literature came to India from Western countries, it was hidden in various stories of ancient times. Whose identity is revealed in Professor Sukumar Sen's book "Crime Kahinir Kalkranti". He says, "The game of intelligence has emerged as a complete branch of detective stories in modern literature, from the beginning of the fifth decade of the nineteenth century. But the seeds of this story, we can also say the sprout-nourished seedlings, have been seen since very ancient times. The primitive crime story that we have found was the game of intelligence."[1] Basically, a detective story begins with a serious problem and the person who takes the main role in solving that problem is the hero or detective or detective. Detective literature reflects the diversity of the character of the detective and their work. Two categories can be observed among these detectives – a) professional b) amateur or hobbyist detectives. However, the investigation method of each detective is different and varied. Bimal Kar adds a new dimension to detective literature by creating the character of the magician detective Kikira. Kikira is not a professional detective, he is an Armchair or hobbyist detective. Even the mystery he is involved in, at the root of it, was the strong desire to help people. The subject of our current research paper is the revelation of the character traits of the magician detective Kikira. In the full research paper, the character of Kikira will be analyzed in the light of one novel written by Bimal Kar about Kikira.

Keywords: Detective, Magic, Literature Intelligence, Humanity Mankind.

বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ বহুমুখী প্রতিভাধর গোয়েন্দা চরিত্রের সমাবেশে পরিপূর্ণ। যদিও গোয়েন্দা সাহিত্যের বীজ পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভারতে এসেছে, কিন্তু প্রাচীনকালের বিবিধ কাহিনিমালার মধ্যে সেটি লুকিয়েছিল। যার পরিচয় বিধৃত রয়েছে, অধ্যাপক সুকুমার সেনের ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি বইতে। তিনি জানাচ্ছেন,

> "বুদ্ধির খেল ডিটেকটিভ গল্পের আধুনিক সাহিত্যে পরিপূর্ণ শাখা রূপে উৎপন্ন হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শুরু থেকে। কিন্তু এগল্পের বীজ, অঙ্কুর-পরিপুষ্ট চারাও বলতে পারি, দেখা গেছে খুব প্রাচীনকাল থেকে। আদিমত্ম ক্রাইম কাহিনী যা আমরা পেয়েছি, সেটি বুদ্ধির খেলই ছিল।"[১]

মূলত গোয়েন্দা কাহিনি শুরু হয় একটি গুরুতর সমস্যা দিয়ে এবং সেই সমস্যা সমাধানের কাজে যিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনিই হচ্ছেন হুনুর বা গোয়েন্দা বা ডিটেকটিভ। গোয়েন্দা সাহিত্যে হুনুর চরিত্র এবং তাঁদের কাজকর্মে বৈচিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। এই গোয়েন্দাদের মধ্যে দুটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ্য করা যায় –ক) পেশাদার খ) অপেশাদার বা শখের গোয়েন্দা। তবে প্রত্যেক গোয়েন্দারই তদন্ত পদ্ধতি আলাদা এবং বৈচিত্রময়। বিমল কর ম্যাজিশিয়ান গোয়েন্দা কিকিরা চরিত্র সৃষ্টি করে গোয়েন্দা সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। কিকিরা কিন্তু

পেশাদার গোয়েন্দা নন, তিনি অপেশাদার বা শখের গোয়েন্দা। এমনকী তিনি যে সমস্ত রহস্য উদঘাটনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, তার মূলে ছিল, মানুষকে সহায়তা করার প্রবল ইচ্ছা। আমাদের বর্তমান গবেষণা পত্রের বিষয় হচ্ছে, ম্যাজিশিয়ান গোয়েন্দা কিকিরার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উদঘাটন। পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্রে, বিমল করের কিকিরাকে নিয়ে রচিত একটি উপন্যাসের আলোকে কিকিরা চরিত্র বিশ্লেষণ করা হবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চল্লিশের দশকের বিখ্যাত ছোটগল্পকারদের মধ্যে বিমল করের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে চতুর্দিকে বিরাজ করছে নৈরাশ্যের কালো ছায়া। এমনই অস্থির পরিস্থিতিতে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে প্রথম অবস্থায় কিছুদিন অগ্রজ লেখকদের ছায়ায় থেকে নিজের লেখার ভিত প্রস্তুত করে নেন।তারপর নিজের প্রতিভার স্পর্শে সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন নতুনধারার ছোটগল্প।তাঁর গল্প সম্বন্ধে সাগরময় ঘোষ জানাচ্ছেন,

> "মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে তন্ন- তন্ন অনুসন্ধান করে তিনি যে দর্পণটি তুলে ধরেন তাতে আমরা সকলেই নিজেদের দেখতে পাই।"[২]

সাহিত্যকে তিনি সর্বপ্রথম ছোটগল্পের ডালিই উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছোটগল্পের পাশাপাশি তিনি উপন্যাস ও কিশোরদের জন্য 'ওয়ান্ডার মামা' নামে একটি রহস্য রোমাঞ্চের সিরিজও লিখেছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। বিমল করের বাল্য, কৈশোর জীবনের অধিকাংশ সময় রেলশহর বা কোলিয়ারি শহরে অতিবাহিত হওয়ায় সেখানকার মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নিজের সাহিত্যে। শুধু তাই নয়, ছাত্রজীবনে পাঠকরা বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ইংরাজি বইয়ের অনুবাদও পড়েছিলেন। বিশেষত তাঁর স্কুল জীবনে ধানবাদ একাডেমিতে অধ্যয়নকালে দুর্ঘটনায় ছমাস শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় অনেক বইপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিমল কর নিজেই জানাচ্ছেন,

> "পথের পাঁচালী এ যেন অন্যপ্রান্ত। কোন এক অজপাড়াগাঁ-নিশ্চিন্দিপুরের গাছগাছালি, মাটি, পুকুর সব-একাকার হয়ে মনের মধ্যে লেপা হয়ে গেল।"[৩]

এছাড়া তাঁর ছোটকাকা ও ছোটকাকিমাও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। ছোটকাকার বাড়িতে থাকাকালীন বিভিন্ন পাশ্চাত্য লেখকদের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এই সমস্ত কিছুই তাঁর লেখক জীবনের ভিত তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন সাহিত্যপত্র সম্পাদনার কাজও করেছেন। অনেক সময় অর্থের প্রয়োজনে নোটবই লেখার কাজও করেছেন। কিন্তু জীবনে কখনো কোনো প্রলোভনের ফাঁদে পা দেননি, এমনকি চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে বিশ্বাস করতেন, তাঁর কাছে মানবিক মূল্যবোধ ছিল সবচেয়ে বড়।এই প্রসঙ্গে তাঁর কন্যা জানাচ্ছেন,

> "যারা বাবার লেখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরা অবশ্যই এটা খেয়াল করেছেন। যারা প্রাজ্ঞজন ধর্মকথা নিয়ে চর্চা করেন আমি তাঁদের পর্যায়ে পড়ি না।তাই ছোটমুখে বড়কথাই বলছি, বাবা মানুষকে বিশ্বাস করতেন, আস্থা রাখতেন।"[৪]

মানুষ হিসেবে বিমল কর ছিলেন অন্তর্মুখী। শুধুমাত্র নিজের প্রিয়জন ও কাছের বন্ধু ছাড়া কারো সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা করতেন না। তবে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ হাটবাজার এমনকী সেলুনে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সেখানকার দিনমজুর মানুষদের সঙ্গে ছিল মন- প্রাণ ও আবেগের গল্প। কিন্তু সমাজে মানুষে- মানুষে হানাহানি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের কাজকে শেষ করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ তাঁকে বিরাট কষ্ট দিত। বস্তুত মানুষকে তিনি মানবিক মূল্যবোধের আলোকে উদ্ভাসিত রূপে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট ম্যাজিশিয়ান গোয়েন্দা কিকিরার চরিত্রেও এই মানবিক গুণগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: কালজয়ী লেখক বিমল করের অন্যান্য গল্প ও উপন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলেও,তাঁর গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে সম্ভবত বিশেষ কোনো আলোচনা হয়নি। তাই এই বিষয়ে গবেষণাপত্রে আলোকপাত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিমল করের "কিকিরাসমগ্র" ১ম খণ্ড এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিবিধ সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলুদা পরবর্তী গোয়েন্দা চরিত্রেদের মধ্যে বিমল কর সৃষ্ট গোয়েন্দা কিকিরার চরিত্র একটি অভিনব সংযোজন। কিকিরার প্রকৃত নাম কিংকর কিশোর রায়, কিন্তু লোকমুখে তিনি কিকিরা নামে পরিচিত। তবে সাহিত্যের অন্যান্য গোয়েন্দা প্রবরদের থেকে কিকিরার তদন্ত পদ্ধতি ভিন্ন। তিনি আর্মচেয়ার বা শখের গোয়েন্দা। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম মমতা ও সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। মূলত স্রষ্টার সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে কিকিরা চরিত্রে। বিমল কর কিকিরা চরিত্রসৃষ্টিতে শার্লক হোমসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জাদুকর হ্যারী হুডিনীর জাদুকরী হাতের অর্থাৎ ম্যাজিকের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যার ফলে আমরা পেয়েছি, এক অভিনব ম্যাজিশিয়ান গোয়েন্দা চরিত্র, যিনি যে কোনো মূল্যে সত্যের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু অহিংস পদ্ধতিতে। কিকিরা চরিত্রের সূচনা প্রসঙ্গে লেখক জানাচ্ছেন,

> "আনন্দমেলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের শুরু থেকে আমায় একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে হয়। কাপালিকরা এখনো আছে সেভাবেই লেখা।... এটাই হচ্ছে আমার কিকিরাকে নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস।"[৫]

কিকিরাকে নিয়ে লেখা বিমল করে উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ১৭টি। প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তিনি প্রতিটি রহস্যের সমাধান করেছেন অহিংস পদ্ধতিতে, মন খারাপে বা পিস্তলের ব্যাপার নেই। এই সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন,

> "গোয়েন্দা গল্প বলতে যা বোঝায় কি কি আর গল্প তা নয়। অপরাধমূলক কাহিনী বলা যায়। খুনোখুনি বন্ধ পিস্তল রক্তপাত এসব ভয়ংকর ব্যাপার কিরার গল্পে নেই যেটুকু আছে তাড়ালে এবং অতি সামান্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।"[৬]

'ঘোড়াসাহেবের কুঠি' উপন্যাসে দেখা যায়, পুজোর ছুটির দুসপ্তাহ আগে থেকে কিকিরার কোনো খবর নেই, চন্দনরা কিকিরার বাড়ি গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। আবার পুজোর ছুটির একদিন আগে, অফিস থেকে ফিরে এসে মালিক বটুকবাবুর কাছে, কিকিরার খবর পায়, তারাপদ, এবং বটুকবাবু এও জানান যে তাকে মেসে থাকতে বলেছেন কিকিরা। সেদিন বিকেলের দিকে কিকিরা এলে তারাপদ কোথায় গিয়েছিলেন জিজ্ঞাসার উত্তরে, কিকিরা রসিকতা করে বলেন–

> "অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলাম মাঝে-মাঝে তোমাদের এই কলকাতায় হাঁপিয়ে উঠি। তখন দু-চারদিন কোথাও পালিয়ে যাই।"[৭]

এরপর তিনি তারাপদকে জানালেন, নিজ নতুন অ্যাডভেঞ্চারের কথা। তিনি দুসপ্তাহ ধরে আসানসোলের কালাপাহাড়িতে ছিলেন, বন্ধু ফকিরচন্দ্রের বাড়িতে। ফকিরচন্দ্রদের একটি কুঠিবাড়ি নিয়ে জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে বিবাদ বেঁধেছিল। যদিও তা মামলা-মোকদ্দমা করে মিটে যেত। কিন্তু তা চরমে উঠল, কারণ সেই বাড়ির ছাদ থেকে কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুন করা হয়েছে বলে রটনা করা হল এবং সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হল বড়তরফের বড়ছেলে বিশুকে । এই বিষয় নিয়ে ছোটতরফ মামলা করতে চাইলেও পারছিল না, কারণ কোনো মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর অন্যদিকে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বড়তরফের ছেলে বিশুর মানসিক অবস্থা দিন-দিন খারাপ হতে লাগল। তাই এই রহস্যের সমাধান করার জন্য ফকিরচন্দ্র, বাল্যবন্ধু কিকিরার দারস্থ হলেন। ঘটনা শুনে তারাপদ বুঝতে পারলো, কিকিরার হঠাৎ অজ্ঞাতবাসের রহস্য। পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়াতে কিকিরা তারাপদকেও তাঁর সঙ্গে কালাপাহাড়ি যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং সেই সঙ্গে সেখানকার শরৎকালের প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দিলেন,তবে সেখানকার কোলফিল্ড তারাপদকে বিশেষ আকর্ষণ করলো। যদিও কিকিরা সেখানে যাওয়ার প্রকৃত কারণ তারাপদকে খুলে বললেন না, কিন্তু তারাপদ নিজে বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করে কোনো রহস্য আছে কী না। বস্তুত কিকিরার সঙ্গে থেকে-থেকে তারাপদ ও চন্দনও এখন ঘটনা তলিয়ে দেখে রহস্যের গন্ধ পেতে শুরু করেছে। তবে এইবারের ব্যাপারটা, খুনের ঘটনা শুনেই, তারাপদর অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সে বলে, সে যেতে চায় না, কিকিরাকে একাই যেতে বলে। তারাপদর অবস্থা দেখে কিকিরা হেসে বলেন,

> "তুমি একটি আস্ত হাঁদা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথা শোননি কখনো। বিষে যেমন বিষক্রিয়া নষ্ট হয়, এখানেও তাই হবে। "[৮]

তারাপদ বুঝতে না পেরে হাঁ করে থাকলে, কিকিরা ঠাট্টা করে বললেন, "তোমার মাথার ঘিলু অনেককাল জমাট ছিল, এবার দেখছি গলে যাচ্ছে। শীতকালে নারকেল-তেল যে ভাবে গলে, সেইভাবে।"[৯] রসিকতা বুঝে তারাপদও তাল মিলিয়ে বলে, সেটাও কিকিরার জন্যই। এরপর কিকিরা জানান যে পরের দিন রাতের প্যাসেঞ্জারে তাঁরা রওয়ানা হবেন। চন্দনকেও যেতে হবে, তবে সে কবে যেতে পারবে, সেটা আগামীকাল জানা যাবে। পরের দিন যাত্রাপথে কিকিরা তারাপদকে ঘোড়াসাহেবের কুঠি নিয়ে যে গোলমাল বেঁধেছে, সেই ঘটনার বিবরণ দিলেন, যদিও বলতে চাইছিলেন না, কিন্তু তারাপদর নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্য, বলতে বাধ্য হলেন। তবে তারাপদকে ঠাট্টা করতেও ছাড়লেন না, মজা করে বললেন যে, " তোমাদের কোথাও নিয়ে গেলেই রহস্যের গন্ধ পাও, তাইনা?"[১০] সঙ্গে-সঙ্গে তারাপদও ঠাট্টার গলায় বলে, তা পাই। কেন পাবো না, বলুন। আপনি কিকিরা দি ওয়ান্ডার। মিস্ট্রিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান।"[১১] কিকিরার ছোটবেলার বন্ধু ফকিরচন্দ্র রায়রা তিন প্রজন্ম ধরে কালীপাহাড়িতে বাস করছেন। তাঁরা বংশগতভাবে ধনীলোক, জমিজমাতো রয়েছেই বটে, কোলিয়ারির সঙ্গেও নানারকম কনট্র্যাকটরি ব্যবসাও শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে সেই ব্যবসাভাগ হয়ে হল তিন। বিশেষ করেন বাবিয়ানা করার জন্য অতটা বাড় বাড়ন্ত, নাহলেও এখনও যথেষ্ট রয়েছে। তবে সমস্ত সম্পত্তির কিছু অংশ নিয়ে এখনও গন্ডগোল রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে 'ঘোড়াসাহেবের কুঠি'। যেটি পাথরের তৈরি দুর্গও বলা যায়। কিকিরার কথায় "এক-একটা পাথর হাতখানেকের বেশি লম্বা চওড়াও আধহাত।"[১২] ঘোড়াসাহেব ছিলেন ফারকোয়ার সাহেব, ওয়েলকাম কোলিয়ারিজ নামে কয়লা কোম্পানির মালিক। উক্ত কুঠিবাড়িটি তাঁরই ছিল। তিনি ঘোড়ার বিষয়ে খুব শৌখিন ছিলেন। আস্তাবলে ঘোড়া ছিল বিভিন্ন প্রজাতির। ফারকোয়ার সাহেব নিজেও ঘোড়ার পিঠে উঠে সকাল-বিকেল টহল দিতেন, তাই লোকের মুখে নাম হয়েছিল ঘোড়াসাহেব। সেই কুঠিবাড়ি কিকিরা দেখেছেন কীনা তারাপদর প্রশ্নের উত্তরে কিকিরা জানান, তাদের ছোটবেলায় সেটা দর্শনীয় বস্তুই ছিল, যেমন কলকাতার মনুমেন্ট সবাই দেখতো, কিন্তু বাইরে থেকে। কিকিরার মামাবাড়ি কালীপাহাড়িতে ছিল। সেসময়ই ফকিরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তখনই তিনি ঘোড়াসাহেবের কুঠি দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ওয়েলকাম কোম্পানির দুর্দিনে সাহেবরা সবকিছু বেঁচে দিয়েছিল। তখনই একজন বাঙালি ভদ্রলোক ঘোড়াসাহেবের কুঠি কিনেছিলেন। তবে সেসময় কুঠিবাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। দুর্ঘটনায় বাঙালি ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীর কাছ থেকে কুঠিটি কিনেছিলেন ফকিরের বাবা ও কাকারা।

সেসময় তাঁদের ব্যবসার রমরমা চলছিল। সেজন্য প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্য কিনেছিলেন বটে, কিন্তু সেটি নিয়ে কী করবেন, তা ভাবেননি। তাই কুঠিবাড়ি এমনিই পড়েছিল। এরপর যখন তাঁদের ব্যবসার অবনতি হতে শুরু করলো এবং এরই মাঝে ফকিরের বাবা ও ক'বছর পর মেজকাকার মৃত্যু হল এবং তখন ব্যবসাপত্র দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়লো, তাঁদের ছেলেদের উপর। এই সময়ই সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধলো এবং যার ফলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেলেও, কুঠিবাড়ির কোনো মীমাংসা হয় না। এবার কুঠিবাড়ির দোতালায় খুন হওয়ায় এবং মৃতদেহ পাওয়া না যাওয়ায়, ফকিরচন্দ্রের খুড়তুতো ভাই অমূল্য আড়ালে ফকিরকে ভয় দেখিয়ে বাড়িটা হাতাতে চাইছে। সেজন্যই কিকিরার সাহায্য তাঁর প্রয়োজন। ঘটনার বিবৃতি শুনে থানাপুলিশ কেনো করা হচ্ছে না, তারাপদর এই প্রশ্নের উত্তরে, কিকিরা বলেন কে মারা গেছে, তার কোনো প্রমাণ নেই,তাই যাচ্ছেনা। পরের দিন কালাপাহাড়ী পৌঁছে, ফকিরচন্দ্রের পাঠানো গাড়িতে,করে গন্তব্য স্থল অর্থাৎ ফকিরচন্দ্রের বাড়িতে পৌঁছে তাঁরা দেখতে পেলেন, সেখানে দুর্গাপুজো হচ্ছে। বাড়িঘর সমস্ত কিছু দেখে তারাপদ মনে-মনে ভাবতে লাগলো, কিকিরার বলা প্রতিটা কথা ঠিক। কিকিরা তারাপদর সঙ্গে, বন্ধু ফকিরচন্দ্রের পরিচয় করান এবং দেখা যায় প্রথম সাকরেদ বলে উল্লেখ করেন, "আলাপ করিয়ে দিই। এই হল সেই তারাপদ। এর কথা তোমায় বলেছি। আমার সাকরেদ।"[১৩] ফকিরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়ার পর, কিকিরা সকালে বাড়ি ঢোকার সময় বন্দুকের আওয়াজ শোনার কথা তুললে, ফকিরচন্দ্র নতমুখে জানান যে বিশু ছুঁড়েছে, যে কুঠিবাড়িতে হয়ে যাওয়া দুর্ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। বিশুকে মোটামটি ডাক্তার দেখিয়ে সামলানোর চেষ্টা করা চলছে। একথা -সেকথার পর কিকিরা ফকিরচন্দ্রের কাছে তাঁদের বংশলতিকা চেয়ে নেন। সেই বংশলতিকা থেকে জানা যায়, ফকিরচন্দ্রের বাবারা ৩ ভাই ছিলেন, ছোটকাকা, সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে সাপের কামড়ে মারা যান। পরের দিন কিকিরা তারাপদকে নিয়ে কুঠিতে গেলেও অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় এবং ভিতরে কিছু শব্দ পাওয়ায় আর কুঠির ভিতরে ঢোকেন নি। পরের দিন অষ্টমীর সকালে তারাপদ যখন রাস্তায় বার হয়ে তখন তার সঙ্গে শশীপদ পঞ্জী নামে

একজন লোকের দেখা হয়, যে দামড়াগাঁ নিবাসী। সে কৌশলে তারাপদর থেকে কথা বার করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারাপদ বুদ্ধি করে এড়িয়ে যায়। এরপর কিকিরার ঘরে এসে দেখে যে তিনি একটি বন্দুক সামনে রেখে চুপচাপ বসেছিলেন। যদিও সে ভেবেছিল যে এটি ফকিরবাবুর বন্দুক কিন্তু কিকিরার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলো, যে এটি তাঁর ম্যাজিক বন্দুক। তারাপদর বিশ্বাস হল না। তখন কিকিরা বুঝিয়ে বললেন যে ওটা তিনি ট্র্যাঙ্কে রাখেন, পার্টসগুলি খোলা যায়, ম্যাজিক দেখানোর সময় দরকার হয়। এরপর তারাপদ কিকিরাকে শশীপদর কথা জানালো, যে নিজের পরিচয় দিয়েছে বৈরাগী হিসেবে। ঘটনা শুনে কিকিরা লোচন অর্থাৎ ফকিরের খাসলোককে দিয়ে, শশীপদর খবর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেইসঙ্গে এও জানালেন যে কুঠিবাড়িতে যে কেউ থাকতে পারে একথা ফকিরকে বিশ্বাস করানো যায়নি, তিনি বলছেন, যে নিশ্চিত কোনো ভাঙা জিনিসের আওয়াজ হয়েছে। শেষপর্যন্ত কিকিরা স্থির করেছেন যে পরেরদিন তিনি, ফকির ও নকুলকে সঙ্গে নিয়ে কুঠিবাড়িতে যাবেন ।এরপর তারাপদ ও কিকিরা মিলে সম্পূর্ণ ঘটনাটিকে আবার পুনরালোচনা করতে গিয়ে দেখলেন, একজায়গায় বারবার থামতে হচ্ছে।রহস্যের মূলটা কোথায়, সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কারণ শুধুমাত্র কুঠিবাড়ির শরিকদের মধ্যে এতটা বিদ্বেষের ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য।এর মধ্যে অন্য কারণও আছে, শুধু সম্পত্তির ব্যাপার হলে কোর্টকাছারি করে মিটে যেত। এই কুঠিবাড়ি নিয়ে অন্য কোনো জটিল সমস্যা আছে, যা ফকিরচন্দ্ররা কিকিরাদের কাছে প্রকাশ করে বলছেন না।তবে যে রহস্যই থাকুক না কেন, সেটি কিকিরার আন্দাজে ফকিরবাবুরাও কদিন আগেই জানতে পেরেছেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল ফকিরচন্দ্রের ছেলে বিশ্বময় বা বিশু, সে ঘোড়াসাহেবের কুঠিতে কেনই বা গেল, সেটিরও কোনো সদুত্তর ফকিরচন্দ্ররা দিতে পারছেন না। তিনি যা ঘটনা বলেছেন তা হচ্ছে, নুনিয়া নদীর কাছে একজন সাধুবাবা এসে ঘাটি গেড়েছিলেন। একটি বড় বটগাছের নিচে সাধুবাবা বসতেন এবং তাঁর সঙ্গী ছিল একটি জংলি কুকুর। যদিও সে সাধুবাবা কাউকে কোনো ঔষুধ দিতেন না তবে খেয়ালের বসে কাউকে-কাউকে ওষুধের কথা বলে দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে বিশুর একজন বন্ধুর মায়ের শরীর খারাপ থাকায় সে কোন দৈব ঔষধ চাইতে সাধুবাবার কাছে গিয়েছিল। সেই বন্ধুর কাছে শুনে বিশু সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করতে যায়। কিন্তু সেদিন সাধুবাবা তার সঙ্গে দেখা করেন না বরং পরের দিন তাকে একা দেখা করতে বলেন এবং সেইসঙ্গে এও বলেন যে তোর মঙ্গল হবে। পরের দিন বিশু যখন সাধুবাবার কাছে যায় তখন তিনি তাকে নিয়ে ঘোড়াসাহেবের কুঠির দোতলার বড় ঘরে যান, সেখানে ছিল চরণমামা যে হচ্ছে অমূল্য মানে বিশুর কাকার শালা এবং তাঁর সহচর। সেখানে সাধুবাবার সঙ্গে চরণমামার কথা কাটাকাটি হয় এবং তখন সাধুবাবার সঙ্গের কুকুরটির চিৎকার করলে চরণের সঙ্গী কুকুরটির মাথায় বন্দুকের বাদ দিয়ে মারে। আচমকা এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বিশু ভয় পেয়ে পালাতে যাচ্ছিল তখন চরণের সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা লেগে বন্দুক পড়ে যায়। কিন্তু সেটিকে তুলতে গিয়েও তুলতে পারেনা, তখন চরণ সেই বন্দুক দিয়ে গুলি ছোড়ে। কিন্তু এরই মাঝে বিশু আবার সাধুবাবাকে জানালা দিয়ে লাফ দিতে দেখেছে। এমন অবস্থা দেখে বিশু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালিয়ে আসে। এরপর থেকেই সে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আছে তাই এর বেশি সে কিছু বলতে পারছে না। সেজন্য খুন আদৌ হয়েছে না হয়নি তা নিয়েও একটা সংশয় রয়ে গেছে। কারণ বিশু দু'রকম কথা বলছে, একবার সে বলছে গুলি চলার শব্দ শুনেছে এবং আবার বলছে গুলির যাকে করা হয়েছিল, সেই সাধুবাবা জানলা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই এখন উক্ত সাধুবাবা বেঁচে আছেন না তিনি পালিয়েছেন সেইটাও রহস্য রয়েগেছে। এই সমস্ত ঘটনার সমাধান কিকিরা পরের দিন ঘোড়াসাহেবের কুঠি বাড়িতে গিয়ে পেলেন। যদিও ফকিরচন্দ্র যেতে পারেন নি তিনি পায়ে চোট পেয়েছিলেন তাই নকুল ও লোচনকে নিয়ে তারাপদ ও কিকিরা কুঠি বাড়িতে গেলেন। সেখানে নীচ তলায় কিছু না পেলেও দোতলাঘরে যে জানলা দিয়ে সাধুবাবা লাফ দিয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে সাধুবাবার অন্তর্ধান রহস্য উদ্ধার করেন কিকিরা। সেইঘরের জানলা এমনভাবে বানানো যে তার পিছনদিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিঁড়িও আছে যা শেষ হয়েছে একেবারে কুঠির বাইরে। অর্থাৎ ডবল জানালা এইগুলো দেখা যেত একসময় ইউরোপের রাজাদের প্রাসাদে, কারণ গুপ্তভাবে আঘাত এলে প্রাণবাঁচানোর জন্য সেই গুপ্তপথে আশ্রয় নিতে হত। তখনই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে সাধুবাবা এই পথ দিয়েই বেরিয়ে গেছেন। কোন খুনের ঘটনা সেখানে ঘটেনি। এই ঘটনার তিন চারদিন পর চন্দন এসে পৌঁছল এবং চন্দনকে দিয়ে বিশুকে পরীক্ষা করিয়ে কিকিরা নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাকে এমনি-এমনি ঔষধ খাইয়ে অসুস্থ করে রাখা হয়েছে। এরপর তিনি আবার শশীপদ বৈরাগীর সঙ্গে দেখা করেন এবং কথা বলে জানতে পারলেন যে ফকিরচন্দ্রদের ছোটকাকা মারা যাননি, ওটা ভুয়ো খবর ছিল। এরপর শশীপদকে আশ্রয় করেই কিকিরা অমূল্যকে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কুঠীবাড়িতে ডেকে

আনলেন। সেদিনই উন্মোচিত হল ফকিরচন্দ্রদের বাড়ির পবিত্র সম্পদ মনসামূর্তির কথা, যা চুরি হয়েছিল এবং সে চুরিটি করেছিলেন তাঁদেরই ছোটকা এবং এই কারণে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছিল। এতদিন পর কাকা ফিরে আসা দুজনেই মনসামূর্তি পাওয়ার লোভে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাকা কাউকে মূর্তি দিতে চাইছিলেন না, বরং এই মূর্তির টোপ দিয়ে তিনি নিজসম্পত্তি থেকে বেদখল হওয়ার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলেন। যদিও এই রহস্য কিকিরাই ভেদ করলেন। কিন্তু প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে ফকিরচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা ধাপ্পাবাজি। তাই মনসামূর্তি উদ্ধারের জন্য ডেকেছিলেন বন্ধু কিকিরাকে কিন্তু পারিবারিক কারণে সব কথা বলতে পারেন নি। কিন্তু কিকিরা নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সাহায্যে সমস্ত রহস্যের সমাধান করলেন। বস্তুত কিকিরার তদন্ত পদ্ধতিতে কোন রক্তপাতের জায়গা নেই, অহিংসা পদ্ধতিতে তিনি তদন্ত করেন।

সূত্রনির্দেশ

১) সেন, সুকুমার। ক্রাইমকাহিনীর কালক্রান্তি। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮ ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ :১২।
২) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, রায়চৌধুরী ঊর্মি, দাশ শচীন (সম্পা)। বিমল কর সময় অসময়ের উপাখ্যান মালা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ: ১০১।
৩) তদেব, পৃ: ৩৩৭।
৪) তদেব, পৃ:১২।
৫) কর, বিমল। কিকিরা সমগ্র (১মখন্ড)। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ৭।
৬) কর, বিমল। কিকিরা সমগ্র (৩য়খন্ড)। প্রথম সংস্করণ ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ:৬।
৭) কর, বিমল। কিকিরা সমগ্র (১ম খন্ড)। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ: ১৭৬।
৮) তদেব, পৃ: ১৭৮।
৯) তদেব, পৃ: ১৭৮।
১০) তদেব, পৃ: ১৮০।
১১) তদেব, পৃ: ১৮১।
১২) তদেব, পৃ: ১৮১।
১৩) তদেব, পৃ: ১৯১।

গ্রন্থপঞ্জি

১) সেন, সুকুমার। ক্রাইমকাহিনীর কালক্রান্তি। প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯।
২) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, রায়চৌধুরী ঊর্মি, দাশ শচীন (সম্পা)। বিমল কর সময় অসময়ের উপাখ্যান মালা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯।
৩) কর, বিমল। কিকিরা সমগ্র (১মখন্ড)। প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯।
৪) কর, বিমল। কিকিরা সমগ্র (৩য়খন্ড)। প্রথম সংস্করণ ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯।